মুক্তির আলোয় নারীরা পেয়েছে অসম্মানের অন্ধকার

তাসরীনা শিখা

বেশ কয়েকমাস আগে আমার পরিচিত বন্ধু শ্রেনীর এক ভদ্রলোক আমাকে অনুরোধ করেছিলেন তাকে একটা নাটক লিখে দিতে তার টেলিফিল্মের জন্য এবং সেই নাটকের শিরোনাম যেন হয় নির্যাতিত পুরুষ।স্বাভাবিক ভাবেই শিরোনামের সাথে মিলিয়ে নাটকের বিষয়বস্তু হিসেবে নির্যাতত পুরুষদেরই তুলে ধরতে হবে। তার কথায় কপাল কুঞ্চিত করে জিজ্ঞেস করলাম, নির্যাতিত পুরুষ মানে? ভদ্রালোক জবাব দিয়েছিলেন, 'কেন এমন পুরুষ কি আছে যে স্ত্রীর হাতে দু'চারটা চড় থাপ্পর খায়নি'। ভদ্রলোকের কথাশুনে আমি হাসবো না বিস্মিত হবো বুঝতে পারছিলাম না। তার কথার জবাবে শুধু বললাম, 'কি জানি আমি তো এমন কোন পুরুষকে চিনিইনা যে স্ত্রীর হতে চড় থাপ্পর খেয়ে নির্যাতিত হচ্ছে'। সেদিন এই বিষয়ে হাল্কা আলাপ আলোচনা দিয়েই ব্যাপারটা চাপা পরে যায়। আমার কখনো লিখা হয়নি নির্যাতিত পুরুষ শিরোনামে কোন লেখা আর সেই ভদ্রলোকও আমাকে কখনো অনুরোধ করেননি লেখার জন্য।

নির্যাতিত পুরুষ চিন্তা করলেই আমরা ধরে নেই এটা একটা কৌতুক। কোন নাটকে বা সিনেমায় কোন মেদবহুল স্ত্রী রান্নাঘরের খুন্তী, চামচ, ঝাড়ু নিয়ে স্বামী ভদ্রলোকটির দিকে ছুটে আসছে, আর দুর্বল শরীরের কিংবা দুর্বলচিত্তের স্বামীটি স্ত্রীর ভয়ে কাঁপছেন, সে দৃশ্যগুলো কৌতুক দৃশ্য হিসেবে নির্বাচিত করা হয় দর্শক হাসাবার জন্য। কোন স্ত্রী কোন স্বামীকে নির্যাতিত করবে এটা একটা কৌতুক সমাজে। পুরষ নারীর চাইতে অনেক শক্তিশালী সে ধারনা জন্মথেকে আজ অবধি আমরা ধারন করে আছি। সবলের উপর দুর্বলের নির্যাতন সেটা একটা হাস্যকর ব্যাপার ছাড়া কিইবা হতে পারে? 'রাজা করিতেছে রাজ্য শাসন, রাজারে শাসিছে রানী'- এই কথা বলে নজরুল নারীর শক্তির অসাধারনত্ব বোঝাতে চেয়েছিলেন, তিনি বুঝতে পারেননি রাজাকে শাসন নারীর শক্তির অসাধারনত্ব নয়, এটা সমাজের একটা কৌতুক। কিন্তু নারীর উপর নির্যাতন এটা কোন কৌতুক কিংবা হাস্যরসের পর্যায়ে পড়ে না। এটা কোন অস্বাভাবিক ঘটনাও নয়। এই নির্যাতন যুগে যুগে কালে কালে বিভিন্নরূপে বিভিন্নভাবে ঘটে যাচ্ছে। এটি সমাজের একটি স্বাভাবিক চিত্র হিসেবে মেনে নিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পুরুষরা মোটেও চিন্তিত না। আর এ নির্যাতনে নারীরা হচ্ছেন ক্ষুব্ধ ও হতাশাগ্রস্থ।

নারী নির্যাতন বলতে শুধুমাত্র শারীরিক নির্যাতনই বুঝায় না, মানসিকভাবে নির্যাতিত হচ্ছে নারীরা। সমাজের বিভিন্ন ধরনের চাপ বিধিনিষেধে নির্যাতিত হচ্ছে নারী। পারিবারিকভাবে নারীর

চিন্তাধারা মতামতকে বানের জলে ভাসিয়ে দেওয়ার মত ভাসিয়ে দিয়ে তাকে গুরুত্বহীন করে তোলা হচ্ছে। এই সবকিছুই এক ধরনের নারী নির্যাতন।

সবধর্মেই বিধাতাকে পুরুষ হিসাবে কল্পনা করা হয়। ছোট বেলায় কল্পনা করেছি এবং এখনো শৈশবে সবার কল্পনা সৃষ্টিকর্তা একজন বিশাল শক্তিশালী সৌম্য পুরুষ যিনি বসবাস করেন সপ্ত আকাশের উপর। বুদ্ধি হওয়ার পরে শিখেছি ঈশ্বরই শক্তি, যার নেই কোন আকৃতি। তিনি পুরুষ ও নারী কিছুই নন। তিনি পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টির স্রষ্টা এবং সবকিছুরই অধিশ্বর। তার ক্ষমতা সীমাহীন। সবকিছু জানার পরও অবচেতন মনে কোথায় যেন তবু কল্পনায় আসে সৃষ্টিকর্তা একজন পুরুষ। কারন আমাদের সমাজে আমরা পুরুষদেরকেই সবচেয়ে শক্তিমান ভেবে নেই এবং সবকিছু সৃষ্টির স্রষ্টা পুরুষই হতে হবে এটাই আমাদের ধারনা। এবং কালে কালে যুগে যুগে পুরুষরাই হচ্ছেন শ্রেষ্ট সৃষ্টিগুলোর স্রষ্টা। নারীরা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিম হতে পারেনি, কিংবা বিজ্ঞানে হতে পারেনি নিউটন। তাদের এ না হওয়ার পিছনে নারীর নির্গুনীতা কাজ করেনি, কাজ করেছে সামাজিক কারন, নারীর সুযোগের অভাব, পরিস্থিতি পরিবেশের অভাব ও নারীর প্রতি সমাজের অবজ্ঞা। পুরুষ সমাজ নারীর সৃষ্টিশীলতায় বিশ্বাস করেনি কখনো, আজও সন্দেহের চোখে দেখে তারা নারীর সমস্ত সৃষ্টিকে। নারীর সৃষ্টিকে যতটুকু ছোট করে দেখা যায় সেই চেষ্টায় পুরুষ সমাজ কখনো পিছপা হন না। মোটামুটিভাবে সব জাতি বিশ্বাস করে নারী দৈহিকভাবে যেমন দুর্বল, মস্তিষ্ক তাদের তেমনই দুর্বল।

মুসলিম আইনে কোন ঘটনার স্বাক্ষীর ক্ষেত্রে দুইজন মহিলাকে একজন পুরুষের সমান বলে গণ্য করা হয়। কোন মহিলা স্বাক্ষী অত্যন্ত উচ্চ শিক্ষিত, বুদ্ধি সম্পন্না বা ক্ষমতাশালী হোন না কেন, আর পুরুষ স্বাক্ষীটি ভিখিরী কিংবা অশিক্ষিত অপদার্থ হোক না কেন, তার সমকক্ষ হতে হলে দুইজন মহিলার প্রয়োজন। এক্ষেত্রেও প্রমানিত হয়েছে একজন অপদার্থ পুরুষও একজন গুণী মহিলার চাইতে বেশী শক্তিমান।

পুরুষ কখনো নারী হয়ে জন্মগ্রহন করার আশা পোষন করেনা। কিন্তু সব পুরুষই চায় পৃথিবীতে নারী থাকুক। তাদের শক্তি, তাদের প্রভুত্ব মেনে নেয়ার জন্য পৃথিবীতে নারীর অনেক প্রয়োজন। নারীর জন্য পুরুষ কৃতজ্ঞ সৃস্টিকর্তার কাছে। আমরা নারীরা স্বামী ও পুত্রের ক্ষমতা ও সমৃদ্ধিকে মনে করি নিজেদের সমৃদ্ধি। বেশীরভাগ বাঙ্গালী মহিলারা নিজেদের মুক্তির, নিজেদের সমৃদ্ধির কথা কখনো চিন্তা করেনা। এক সময় ছিলো যখন নারীরা ছিলো অবরুদ্ধ। চার দেয়ালের মাঝে তাদের জীবন ছিলো। অন্তপুরীতে তাদের জীবন কাটতো। তাদের জীবনে কোন আলো ছিলো না, আসলে তাদের কোন জীবনই ছিলো না। শিক্ষার আলো তখন নারীরা দেখেনি। স্বাধীনতা বা মুক্তির

ছোয়া নারীরা তখনো পায়নি। সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিবাহিত মেয়েদের জীবন কাটতো অবরোধের মাঝে দাসীবাদী নিয়ে ও সন্তান লালন পালন করে। পুরুষরা অন্দর মহলে খুব কমই আসতো। তারা আসতো রাতে স্ত্রীদের সাথে মিলিত হতে। তাছাড়া তাদের আনন্দের জন্য ছিলো পতিতালয় এবং রক্ষিতা। স্ত্রী ছিলেন ঘরের একটা দামী আসবাব পত্র - যার ছিলো না কথা বলার কিংবা প্রতিবাদের ক্ষমতা। স্ত্রীর কর্তব্য ছিলো বংশ রক্ষা করা। উনিশ শতকের আগে বাঙালী স্বামী স্ত্রীদের মধ্যে কোন মানবিক সম্পর্ক ছিলো না। তাদের কাছে মানসিক সম্পর্ক ছিলো অজানা। যতটা সম্পর্ক ছিল সেটা ছিল বংশবিস্তারের সম্পর্ক।

মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের দাসীবাদীর বাহুল্য ছিলো না বলে তারাই শশুর বাড়ীতে দাসীর ভুমিকা পালন করতো। শশুর বাড়ীর সেবা যত্ন ও গভীর রাতে স্বামীর সঙ্গলাভ করে তাদের জীবন কাটতো। শশুর বাড়ীতে তাদের সম্মান না থাকলেও, শশুর বাড়ীর সম্মান রক্ষা করা ছিলো তাদের দায়িত্ব। নিম্নবিত্ত নারীরা কখনো অবরুদ্ধ ছিলো না। তাদের জীবনধারনের জন্য তাদের বেরোতে হয়েছে বাড়ীর বাইরে। দরিদ্র নারীরা ছিলো ভাত কাপড়ের চিন্তায় অস্থির । সমাজ নিয়ে চিন্তা করার বা নিজের কথা বলার অধিকার তাদের কখনোই ছিলো না। সেই সময় পুরষরাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে নারীর জীবন সম্পর্কে এবং এখনো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই রীতি প্রচলিত আছে। তখন নারী পুরুষের কোন বিবাদ ছিলো না, কারন যেখানে সংগ্রাম নেই সেখানে সংঘাত কিসের।

ধীরে ধীরে অনেকটা সময় পেরিয়ে অন্তপুরীতে কিছুটা আলোর রশ্মি প্রবেশ করে। নারীরা নারী শিক্ষা পাওয়ার ও নেয়ায় উৎসাহিত হয়। বেগম রোকেয়া ছিলেন বাঙ্গালী মুসলমানদের এক মহিয়সী নারী। রোকেয়ার সমগ্র রচনাবলী ভরে ছিলো পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ঘৃনা। পুরুষদের প্রতি তিনি যে কিছুটা করুনা ও সহানুভুতি দেখিয়েছিলেন সেটা হয়তো ছিল তাঁর ভাই ও স্বামীকে সম্মান দেখিয়ে। তাঁর রচনার লক্ষ্য ছিল পুরুষতন্ত্রকে দুর্বল করে নারীকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। প্রগতিশীল চেতনায় তিনি এগিয়ে ছিলেন সে সময়কার মুসলমান ও হিন্দু সমস্ত পুরুষ, নারী ও মহাপুরুষদের থেকে। চব্বিশ বছর বয়সে তিনি প্রচন্ড আক্রমন করেছিলেন ধর্মকে, সে আক্রমনের পরেও তিনি টিকে ছিলেন তার কারন তখন পরিবেশ ছিলো ভিন্ন। তখন পুরুষতন্ত্র নারীকে অবজ্ঞা করলেও অসম্মান করেনি। আজ এই ধরনের লেখা লিখলে রাস্তায় তার লাশ পাওয়া যেত বা নিন্দিত জীবন কাটাতে তিনি বাধ্য হতেন নির্বাসনে। বেগম রোকেয়া বিশেষ কোন ধর্মকে নয় তিনি সমস্ত ধর্মেরই সমালোচনা করেছিলেন তাঁর রচনা ও কাব্যে। পরবর্তী সময়ে পুরুষতন্ত্রের ও ধর্মীয় চাপে তিনি কিছুটা সমঝোতা করেছিলেন এবং তাঁর লিখার কিছু অংশ বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯০৪ সালে বেগম রোকেয়া নারী ও ধর্মকে নিয়ে লিখে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, আজ যদি কেউ এই কথা বলতে বা লিখতে চায় তাহলে তাকে প্রকাশ্যে লাঞ্ছিত করা

হবে। নারী যখনই মুক্তি ও স্বাধীনতার পদধ্বনি শুনতে শুরু করেছে তখন থেকেই নারীর প্রতি পুরুষের অসন্মান সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। যতদিন নারী অবরুদ্ধ, অবলা, অসহায় ছিল ততদিন নারীর প্রতি কোন আঘাত আসেনি। তারপরও নারীকে সম্মান দেয়ার প্রচলন বহুযুগ যাবৎ ছিল যা এখনকার সমাজে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। পিছনে নারী সম্স্লর্কে যতই অবজ্ঞা, অবহেলা ও কটু কথা বলা হতোনা কেন কিন্তু কোন নারীকে সরাসরি অপমান করার প্রচলন তখনও ছিল না। পঞ্চাশ দশকে বাঙালী নারীরা স্বাধীনতা ও শিক্ষার পদধ্বনিতে দ্বারখুলে বেড়িয়েছে। ষাট দশকে শিক্ষাঙ্গনে, বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীর বিচরন ঘটেছে। সত্তর দশকে নারী জাগরন তুঙ্গে উঠেছে। সবক্ষেত্রে তখন নারীর বিচরন শুরু হয়েছে। তখনও নারীর সম্মান ছিলো। নারীদের দেখে উঠে দাঁড়ানো, সমীহ করে কথা বলা, নারীকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা, সেই ব্যাপারগুলো পুরুষদের মাঝে তখনও প্রচলিত ছিলো। সত্তর দশকে, এমনকি আশির দশকেও মহিলাদের মিছিলের সামনে রাখা হতো এই ভেবে যে পুলিশ সরাসরি নারীদের আক্রমন করবে না। কিন্তু এখন কোথায় গেছে নারীর সেই সম্মান? নারীদের টেনে হিচড়ে অর্ধ উলঙ্গ করে পুলিশের ভ্যানে তোলা হচ্ছে। জেলে ঢুকিয়ে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে। লাথি মারা হচ্ছে পেটের সে স্থানে যেখানে সিজারিয়ানের মাধ্যমে তার শিশুর জন্ম হয়েছিলো।

বেড়েছে সমাজে নারী ধর্ষন, নারী নির্যাতন। বাক স্বাধীনতার অপরাধে অপমানিত হচ্ছে নারী সমাজ। বিদেশী পত্রিকায় যখন আমাদের বাঙ্গালী নারীদের এই নির্যাতনের লজ্জাজনক চিত্র ছাপা হয় তখন আমাদের লজ্জায় মুখঢাকা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। নারী মুক্তি ও অধিকার আদায়ে যখন সোচ্চার হয়েছে তখন থেকেই পুরুষতন্ত্র নারীর ব্যাপারে হয়েছে হিংস্র ও নিষ্ঠুর। নারীকে তার সর্বব্যাপারে আক্রমন করা, অপমান করা, অবজ্ঞা করা যে একটা অশোভনীয় ব্যাপার সেটা পুরুষতন্ত্রের কিছু পুরুষের বোঝার অসাধ্য। পুরুষতন্ত্র নারীর সতীত্ব নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, অথচ নারীর সতীত্ব নষ্ট করে পুরুষেরাই।

নারী অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে, অন্ধকার অন্তপুরী থেকে বেড়িয়ে হাটি হাটি পা পা করে নারী শিক্ষা গ্রহন করেছে। তারপর সময়ের সাথে সাথে সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান শিক্ষা অর্জন করে যখন নারীরা সমাজের বিভিন্ন স্তরে তাদের স্থান আদায়ের দাবী জানাতে শুরু করেছে এবং নারী মুক্তির আলোক রশ্মি গায়ে মেখে অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়েছে তখন থেকেই শুরু হয়েছে সংঘাত। বাঙ্গালী নারী পুরুষতান্ত্রিক সমাজে হারিয়েছে তাদের সম্মান। আমরা নারীরা মুক্তির আলোকে এগিয়ে চলতে যেয়ে এবং নিজের বাক স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে অধিকার আদায়ের চেতনায় এগোতে যেয়ে বারবার হচ্ছি লাঞ্ছিত এবং অপমানিত। নারীর অধিকার, নারীর মুক্তি ও নারীর সম্মান সবকিছু একসাথে

নারীকে দিয়ে বাঙ্গালী পুরুষতন্ত্র নিজেদের এতটা দুর্বল ও উদার প্রমান করতে মোটেও রাজী নয়। যার ফলে আমরা বাঙ্গালী নারীরা মুক্তির আলো দেখতে যেয়ে অসম্মানের অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছি।